অষ্টম অধ্যায়

লোক-ভাষা ও লোকনাটক

ভূমিকা: লোকায়ত জীবনকে কেন্দ্র করে লোকায়ত দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে রচিত হয় এবং অভিনীত হয় লোকনাটক। লোকায়ত দর্শকদের সামনে অভিনীত হয় বলে এর ভাষারূপ লোকজীবনকেন্দ্রিক ও আঞ্চলিক ভাষা অনুসারী। তাই যে সব অঞ্চলে লোকনাটকগুলো রচিত ও প্রচলিত সেসব অঞ্চলের লোকভাষাই এই নাটকগুলোর ভাষারূপ হয়ে থাকে।

একটি সংহত সমাজ ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমারেখার মধ্যে থেকে যে ভাষা ব্যবহার করে তাকে লোকভাষা বলা হয়। যদি এই লোকভাষা একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বহুসংখ্যক মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত হয় তখন সেই ভাষাকে উপভাষা বলা হয়। এক একটি উপভাষা-এলাকার লোকভাষায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য প্রচুর পরিমাণে থাকে। একই উপভাষার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রয়োগের ক্ষেত্রে রূপগত, ধ্বনিগত পার্থক্য ঘটে। এই প্রয়োগ-পার্থক্য লক্ষ্য করে উপভাষার আঞ্চলিক রূপকেই লোকভাষা বলা যায়।

লোক-সাহিত্যে লোকভাষার প্রভাব সর্বাধিক। কিন্তু লোকনাটকের ক্ষেত্রে দেখা যায় লোকভাষার প্রকৃত এবং হুবহু অনুসৃতি নেই। লোকনাটক "লোকমুখের ভাষার ছায়ায় রচিত 'সংহত' সমাজের ফসল হলেও তা কয়েকজন সাহিত্য-মনস্ক অখ্যাত 'ভাবুক' (লোক-সাহিত্যিক) - এর দাবিহীন সৃষ্টি, সম গ্র সমাজের সৃষ্টি নয়। বলা যায়, লোক-সাহিত্যের ভাষা রচনার দায়িত্ব অল্প কয়েকজনের। তুলনায় লোকভাষা লোকজীবনের সমস্ত অংশীদারদের ব্যবহারিক সম্পদ।" (১)

একই উপভাষাভাষী এলাকায় অঞ্চলভেদে লোকভাষার কিছু বাচনিক আচরণের পার্থক্যও দেখা যায়। এই পার্থক্য কেবল আঞ্চলিকতার জন্যে সৃষ্টি হয়। ক্ষেত্র সমীক্ষার সময় দেখা গেছে একটি উপভাষা- প্রধান বিভিন্ন জেলায় বাচনিক প্রয়োগের অনেক পার্থক্য। সেই ক্ষেত্রে লোকভাষা হিসেবে তাকে গণ্য করতে হয়।

বাংলা ভাষার উপভাষাগুচ্ছের মধ্যে বরেন্দ্রী ও কামরূপী উপভাষা উত্তরবঙ্গে ব্যবহৃত হয়। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চল, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রাজবংশী, দেশী, পলি সমাজে কামরূপী উপভাষা প্রচলিত। মালদহ জেলায় প্রচলিত বরেন্দ্রী উপভাষা।

মালদহ জেলায় বহু সম্প্রদায় বাস করে এবং বিভিন্ন বাচকগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন লোকভাষা বর্তমান। বিহার সংলগ্ন মালদহের দিয়াড়া অঞ্চলে হিন্দী ভাষার প্রভাবান্বিত খোট্টাই ভাষা প্রচলিত। দীর্ঘকাল নবাবী রাজত্বে বাস করে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বাংলাভাষা প্রচলিত তাকে 'মুসলমানী বাংলা' বলা হয়। এই মুসলমানী বাংলায় আরবী, পার্শী শব্দ বহুল মিশ্রিত হয়েছে। এখানকার বরিন্দ অঞ্চলে রাজবংশী ভাষার প্রভাব দেখা যায়। মালদহে বিভিন্ন লোকভাষা থাকলেও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত রয়েছে বরেন্দ্রী উপভাষা।

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন মহকুমার লোক-সাধারণ বিভিন্ন লোক-ভাষা ব্যবহার করেন। ইসলামপুর মহকুমার লোক - ভাষাকে 'কাইথী বাংলা' বা 'সূর্যাপুরী বাংলা'ও বলা হয়। রায়গঞ্জ মহকুমায় প্রাচীন দেশী পলিয়া রাজবংশী শ্রেণীর লোক-গোষ্ঠী অধ্যুষিত এবং তাদের ব্যবহৃত লোক-ভাষা কামরূপী বাংলার সমগোত্রীয়। বালুরঘাট মহকুমায় 'কোচি বর্ষীয় লোক-ভাষা' প্রচলিত। কোচি বর্ষীয় লোকভাষা প্রাকৃত ঘেঁষা অপভ্রংশ ও ভগ্নতৎসম উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রবহমান। এই ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্য এখানে তুলে দেয়া হল —

(১) অ - স্থানে র, র - স্থানে অ, ল - স্থানে ন, ন - স্থানে ল ব্যবহৃত হয়।

(২) যুক্তব্যঞ্জনে বর্ণদ্বিত্বের আমদানি।

(৩) ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'ঘর' প্রত্যয়ের এবং সপ্তমীতে 'তে'- র বদলে 'ৎ'- এর ব্যবহার।

(৪) ক্রিয়াপদে হ, ই, ও - এর ব্যবহার নেই।

দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলে নেপালী বা গোর্খালী ভাষা প্রচলিত। কিন্তু সমভূমি অঞ্চলে রাজবংশী, দেশীদের মধ্যে কামরূপী উপভাষা মিশ্রিত রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

"জলপাইগুড়ি জেলায় বাংলারই একাধিক উপভাষা প্রচলিত। স্বাধীনতার আগে প্রায় একশো বছর ধরে উপভাষার স্তর ছিল মোটামুটি দুটি — (১) কামরূপী, (২) বঙ্গালী-বরেন্দ্রী মিশ্রিত এক ধরণের বাবু বাংলা। কামরূপী উপভাষাই সংখ্যা গরিষ্ঠ। জেলার রাজবংশী ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই উপভাষার প্রচলন সর্বাধিক।" (২) কিছু কিছু শব্দে কোচিবর্ষীয় ও বরেন্দ্রী প্রভাব লক্ষ করা যায়।

কোচবিহার জেলার প্রাচীন লোকগোষ্ঠী হল রাজবংশী লোক-সমাজ। এদের কথ্যভাষা বাংলার কামরূপী উপভাষা।

উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত গ্রামীণ লোকসমাজে নানা পরিবর্তন এলেও এখানকার লোকজীবনে কেন্দ্রীয় নাগরিকতার প্রভাব অনেক কম। ফলে এখানকার লোকভাষায় ভাষাতাত্ত্বিক টানাপোড়েন এখনও অকৃত্রিমভাবে পাওয়া যায়।

উত্তরবঙ্গের মানুষের সামাজিক মন্থরতা ও রক্ষণশীলতা থাকায় এখানকার উপভাষায় বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ কিছু কিছু এখনও সজীবভাবে বর্তমান। তবু এই রক্ষণশীলতার পাশাপাশি একটি নতুন ভাষিক পরিস্থিতি জেগে উঠেছিল প্রায় সোয়াশো বছর আগে। তখন চা-শিল্পের পত্তনকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়ি জেলায় এবং মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের আধুনিকীকরণের সূত্র ধরে কোচবিহার জেলায় (তদানীন্তন দেশীয় রাজ্য) বাংলার অন্য এলাকার মানুষের আনাগোনা শুরু হয়। এই সকল আগন্তুকদের বেশীর ভাগই পূর্ববঙ্গ ও মধ্যবঙ্গের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি। এদের ভাষা মূলতঃ ব'ঙ্গালী ও বরেন্দ্রী। এই শ্রেণী ছিল সংখ্যালঘু, কিন্তু বিদ্যা, বুদ্ধি, বিত্ত ও সামাজিক প্রতিপত্তিতে গরীয়াণ; তাই এদের ভাষাই উত্তরবঙ্গের লোকসমাজে মর্যাদাসম্পন্ন ভাষারূপে স্বীকৃত হত। কিন্তু সামাজিক আদান প্রদানের নিবিড়তার অভাবে কামরূপীভাষী বাচকগোষ্ঠী অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের রক্ষণশীল গোষ্ঠীর কোন দ্বি-স্তরীয় ভাষা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি। কিন্তু স্বাধীনতালাভের পর দেশ বিভাগের ফলে অসংখ্য বঙ্গালী ও বরেন্দ্রীভাষী শরণার্থী পূর্বপাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এখানকার গ্রামেগঞ্জে কামরূপীভাষীদের নিত্য প্রতিবেশী হিসেবে বসতি শুরু করে এবং তখনই সামাজিক আদান প্রদানের অনিবার্যতার ফলে উভয় পক্ষেই ভাষিক দ্বিস্তর গড়ে ওঠে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে মিশ্রভাষারও সৃষ্টি হয়েছে।

বর্তমানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন উপভাষীদের কাছে রাঢ়ী-আশ্রিত চলিতভাষা মর্যাদার আসনে আসীন। কারণ ষাটের দশক থেকে প্রতিরক্ষা বিভাগের তৎপরতা, ফারাক্কা সেতু নির্মিত হওয়ায় স্থল-পরিবহনের সুবিধা ও উন্নতি হয়েছে; এর ফলে ব্যবসা বানিজ্য ও চাকুরীর সম্প্রসারিত সুযোগ পেয়ে দক্ষিণবঙ্গের রাঢ়ীভাষী লোকদের আনাগোনা বেড়েছে। শিক্ষার প্রসার, আর্থিক উন্নয়ন হওয়ায় সংবাদপত্র, রেডিও, টিভির প্রচলন বেড়েছে; এর ফলে রাঢ়ী আশ্রিত চলিত বাংলার প্রসার ঘটেছে। উত্তরবঙ্গের শিক্ষিত ও আধুনিক ভাবাপন্ন লোকদের ভাষা রাঢ়ী আশ্রিত চলিত বাংলা ভাষা হিসেবে প্রচলিত হয়েছে। আঞ্চলিক উপভাষাভাষীদের শিক্ষিত ও আধুনিক ভাবাপন্নরাও ঐ রাঢ়ী আশ্রিত বাংলা চলিত ভাষাকে ঘরের বাইরে

ব্যবহার করতে থাকে। এই ভাষা ব্যবহারের সময় দেখা যায় ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের দিক থেকে কিছু বিচ্যুতি ও মিশ্রণ দেখা যায়, তবু ঐ ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা ক্রমবর্দ্ধমান।

জলপাইগুড়ি জেলায় চা-বাগানের শ্রমিক ও বনাঞ্চলের কিছু আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভাষা জলপাইগুড়ির মূল জনস্রোতের ভাষা থেকে আলাদা। চা-শ্রমিকদের মধ্যে সাদ্রী ভাষা, বোড়ো-রাভাদের রাভা ভাষা, টোটোদের টোটো ভাষা প্রচলিত।

ডুয়ার্সের চা-শ্রমিকদের আনা হয়েছিল রাঁচি, ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে। তাই তাদের মধ্যে সাদ্রী ভাষার প্রচলন ছিল। অনেকে বলেন ভোজপুরী, মাগধী ভাষার মিশ্রণ রয়েছে এই ভাষায়। নমুনা হিসেবে "সাদ্রী ভাষার" একটি গান এখানে উল্লেখ করা হল।

"কা করে গেলিভান তো বৃন্দাবন
এ সুনন্দরী গইয়ারে
কা করে গেলি যমুনা।
কাঠি খোঁজেক গেলি
ভল্‌তো বৃনদাবন
এ সুনন্দরী গইয়ারে
পানী ভরেক গেলি যমুনা।"

এই গানটির বাংলা অনুবাদ হল এরকম —

"কেন গেলেগো তুমি বৃন্দাবন
ও ওগো সুন্দরী
কেন গেলে তুমি যমুনা
জ্বালনী কাঠ আনতে বৃন্দাবন গিয়েছিলাম গো
জল আনতে গিয়েছিলাম যমুনা।" (৩)

চা-বাগানের অন্যান্য আদিবাসী যেমন ওঁরাও, সাঁওতাল, মুন্ডা, খড়িয়া সকলেই সাদ্রী ভাষা জানে, কিন্তু এদের নিজস্ব উপজাতীয় ভাষা আছে। চা-বাগানের সকল উপজাতীদের Lingua franca হল সাদ্রী ভাষা।

রাভা ভাষার একটি নমুনা এখানে উল্লেখ করা হল —

"তিঙ্ তক্ তিঙ্ তক্ বনিরং
পির হাসামী কামার
চেরেক হাসামী মিচাল্‌দ
না তেঙ ঝামার ঝামার"

এই গানটির বাংলা রূপান্তর হল — "লোহাপেটায় তিঙ তক্ তিঙ তক্ বোলে উত্তর দেশের লোহার; আর দক্ষিণ দেশের মেয়েগুলো — বড়ই তাদের বাহার।" (৪)

টোটো ভাষার নমুনার জন্য এখানে একটি টোটো গান উল্লেখ করা হল —

"জুগোপেতি — জুগো চায়,
এ যাচে নাংতেই — লেমু — নালেয়া,
তামু — মেংতু — পুঁই — জুগো — চয়ে,
মিগা — সাচি — গৈন্তু তে জুগো চয়ে।"

এই গানটির অর্থ হল — "ওহে বুনোজানোয়ারেরা। তোমরা যেন ফাঁদে ধরা না পড়ো। কেউ যেন তোমাদের মারতে না পারে। তোমরা চিরকাল তোমাদের পথে চলতে থাকো। তোমরা আমাদের ক্ষতি করো না।" (৫)

সংহত সমাজে বা কোন লোকগোষ্ঠীর ভাষা নানা কারণে পরিবর্তিত হলেও স্ত্রীলোকের মৌখিক ভাষার রক্ষণশীলতা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। তাই লোক-সাহিত্যের কিছু শাখায় যেমন, প্রবাদ- প্রবচন, ছড়া, ছেলে ভুলানো ছড়ার ভাষা স্ত্রীলোকের সৃষ্টি। তাই স্ত্রীলোকের ভাষা লোক-সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

সংগৃহীত লোকনাটকের ভাষাঃ লোকনাটক আঞ্চলিক ভাষায় তাৎক্ষণিকভাবে রচিত ও অভিনীত হয়। তাই অঞ্চল ভেদে নাটকের ভাষারও প্রভেদ ঘটে। তাছাড়া রচনাকারদের ও নাটকের কুশীলবদের সামাজিক, ভাষিক, আর্থিক, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে নাটকের ভাষা সৃষ্টি হয়। " লোকনাটকের উদ্ভব ও প্রয়োগ যে সামাজিক কাঠামোর সেই সমাজ আদিম সমাজের মতো মধ্যে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ও আত্মসংবৃত নয়, বাইরের জগৎ সমাজের উপরতলার সঙ্গে তার সামাজিক টানাপোড়েনের সম্পর্ক তার জীবনযাত্রাকে যেমন অল্পবিস্তর স্পর্শ করে তেমনি তার ভাষাব্যবহারও সেই সামাজিক টানাপোড়েনের ছাপ পড়ে, এই কারণেই একই স্থানের সম-উপভাষা ব্যবহারকারীদের ভাষা ব্যবহারে ব্যক্তিবিশেষের বৃত্তি-বয়স-শিক্ষা-লিঙ্গ ইত্যাদি সমাজনিয়ন্ত্রিত প্রভেদসূত্র অনুসারে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়।"(৬) তবে লোকনাটক সার্থক হয় লোকভাষা ব্যবহারের জন্য এবং স্পষ্টবোধগম্যতার জন্য বিশেষ বাক্‌ভঙ্গী প্রয়োগের ফলে।

ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেছে লোকনাটক রচয়িতাদের কেন্দ্রীয়ভাষা অনুসরণের প্রতি ঝোঁক বেশী। মালদহের গাজোল থানার ধ্যামধ্যামা গ্রামের সুবোধদেশীয় বক্তব্য "লোক-নাটকের ভাষা প্রয়োগ করা হয় শ্রোতার মান ও রুচি অনুসারে, আঞ্চলিক ভাষা-বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে। তবুও তার মধ্যেই কেন্দ্রীয়ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা বেশী লক্ষ করা যায়।"(৭) এর একটা বড় কারণ এই যে দর্শক-শ্রোতাদের ভাষাভঙ্গির বিভিন্নতার কথা সবসময় মনে রাখতে হয় গায়ক-অভিনেতাদের। দৃশ্যকাব্য লোকনাটককে হয়ে উঠতে হয় সকলের বোধগম্য। এর ফলে ভাষা রূপটি সবসময়েই বিবর্তিত হয়, মিশ্রিত একটা রূপ নেয়।

মালদহজেলার লোকনাটকের ভাষাঃ মালদহের লোকভাষায় বরেন্দ্রী, হিন্দী,মৈথিলী, খোট্টা প্রভৃতি উপভাষা ও ভাষার মিশ্র রূপ রয়েছে। এখানকার আঞ্চলিক ভাষায় একটি বিশিষ্ট সুরের টান রয়েছে। যেমন, করেছে - কর‍্যাছে; হয়ে - হয়্যা; বসিয়া - বোস্যা; ফেলেছি - ফেল্যাছি; ইত্যাদি।

এখানকার লোকভাষায় তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বহু আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহৃত হয়। কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হলঃ

লদবোদ্যা (মোটাসোটা), বাঁশুয়া(বাহন), আলাদ(বিষধর সাপ), হলুক মুখা (বিচিত্র মুখভঙ্গী বিশিষ্ট), পোষ্যা (ঢুকতে), ইত্যাদি।

এধরণের অজস্র আঞ্চলিক শব্দ যা কেন্দ্রীয় ভাষায় ব্যবহৃত হয় না, লোকনাটকে ব্যবহৃত হয় বলে লোকনাটক চিত্তাকর্ষক হয় কিন্তু সর্বত্র বোধগম্য হয় না।

গম্ভীরা গানের 'বন্দনা' অংশে শিবকে কখনও 'নানাহে' বলে সম্বোধন করা হয় না। 'নানা' শব্দটি মুসলমানী। এর অর্থ 'দাদু' বা 'ঠাকুরদাদা'।

গম্ভীরার 'বন্দনা' অংশটিতে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয় যা অন্য কোন জেলার লোকনাটকে পাওয়া যায় না। মালদহের আঞ্চলিক ভাষায় যেমন গীতিময়তা আছে, তেমনি আছে নাটকীয় ভাব প্রকাশের শক্তি। 'ডুয়েট, চারইয়ারী' ও রিপোর্ট' অংশে অনেক সময় গদ্যসংলাপও ব্যবহৃত হয়। গদ্যসংলাপ হল গানেরই পরিপূরক। সেজন্য গানগুলো অবেগময় কাব্য প্রধান নাহয়ে বিষয় বস্তু নির্ভর হয়। আগে থেকে রচিত হলেও সংলাপ সর্বদা তাৎক্ষণিকভাবে মঞ্চেই রচিত হয়।

গম্ভীরার শিল্পীরা অনেক সময় বাংলা, হিন্দী, ইংরাজী মিলিয়ে চেষ্টাকৃত বিকৃত উচ্চারণ করেন; আবার শব্দ ভেঙ্গে বা জুড়ে নতুন শব্দ তৈরী করেন। এধরণের শব্দ বৈচিত্র্য আনে এবং নতুন মাত্রা সৃষ্টি করে; এতে গম্ভীর শব্দ হাল্কা হয়

আবার হাল্কা শব্দ গম্ভীর হয়। যেমন -

(ক) মিঞা—কই নাস্তা পানি চা লিয়া আন
বিবি — আনবো কি ? এখানে বড় চিনির টান
.....
মিঞা — তুই চিনির চায়ে মিঠা আহলাদের টী -ন
(তুই) চোখের মনি আশ্‌মানের চান।
(ডুয়েটঃ গোবিন্দলাল শেঠ)

(শব্দার্থঃ নাস্তা - জলখাবার। পানি - জল। লিয়া - নিয়ে। টী — টা - চা - টা। আশমানের - আকাশের। চান - চাঁদ।)

(খ) "মেয়েরা ছিল পর্দানশীল
এখন, ফেলে দিয়ে ড্রপসিন
রাস্তায়তো, নাইকো লাজশরম" (৮)
(ড্রপসিন - ঘোমটা।)

গম্ভীরা গানে অলঙ্কারের ক্ষেত্রে যমক ও শ্লেষ অতিমাত্রায় ব্যবহৃত হয়। এর ফলে গানে ও সংলাপে কাব্যগুণ ও সাহিত্যগুণ অতিমাত্রায় দেখা যায়।

গদ সংলাপে বাক্‌চাতুর্য গম্ভীরাগানের একটি বড় সম্পদ। " প্রায় চল্লিশ বছর আগের জনপ্রিয় গম্ভীরা শিল্পী মজিদ মিঞার একটি সংলাপ নৈপুন্যের উদাহরণ ঃ

সহঅভিনেতাঃসব জিনিসে ট্যাক্স বেড়ে গেল রে।
চাল - ডাল - তেল - কয়লা -
এমনকি আমরা যে ভাত খাচ্ছি
প্রত্যেকটা ভাতের উপর ট্যাক্স বসানো আছে।
মাজিদ মিঞাঃ ঐজন্যে ভাতটা ভারী লাগছেরে।" (৯)

গম্ভীরাগানে ছোট, বুদ্ধিদীপ্ত, ব্যাঞ্জনাগর্ভ সংলাপ ব্যবহৃত হয়। মালদহ জেলার যেনেটিক প্যাটার্ন গদ্যসংলাপের শিল্পগুণ অনেক বাড়িয়েছে। অলিখিত শব্দধ্বনি প্রয়োগকলার বিশিষ্টতায় গম্ভীরা তাৎপর্য লাভ করে। স্বভাব কবিত্বময়, দ্বর্থ্যবোধক গীতি সংলাপে সমৃদ্ধ গম্ভীরাগান।

গম্ভীরাগানে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার এবং আঞ্চলিক উচ্চারণ রীতির ব্যবহার থাকলেও বরেন্দ্রী উপভাষা ও কেন্দ্রীয় চলতি ভাষার প্রভাব যথেষ্ঠ পরিমানে রয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় শর্মা ও গোপালদাসের রচনায় কেন্দ্রীয় বাংলা চলিত ভাষা ব্যবহার করতে দেখা গেছে। যেমন -

এমন রাজা আর হবে না প্রজার বহু ভাগ্যবল
ধনে ধ্যানে জ্ঞানে মানে ভাগ্যলক্ষ্মী সদা অটল।
.....
(মৃত্যুঞ্জয় শর্মা)
ক্ষুদ্র বিনাশ করতে বুঝি ধরেছ হে রুদ্রবেশ
জলে স্থলে আগুন জ্বলে, চোখের জলে ভাসে দেশ।
.....
(গোপাল দাস)

আলকাপ লোকনাটকে কেন্দ্রীয় চলতিভাষার বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সংলাপের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষা বা শিল্পীর ভাষা ব্যবহৃতহয়। সামাজিক চলিষ্ণুতার উপর নির্ভর করে ভাষিক পরিস্থিতি। শিল্পীদের ব্যক্তিগত জীবনে চলিষ্ণুতা না থাকলেই আঞ্চলিক ভাষা সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়।

মালদহের পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় হিন্দীভাষার প্রভাবে প্রভাবান্বিত খোট্টাই ভাষা প্রচলিত থাকায় আলকাপের গানে বা সংলাপে তার প্রভাব পড়েছে অনেক ক্ষেত্রে। যেমন -

" চৈতা বৈশাখা পিয়া গরামাকা দিন
রাতিয়ামে খাটিয়াসে নাহি আবাই নিন্।
ছোড় পিয়া ছোড় যানে দো বাজারিয়া
ঝালামালাহা পান্খা কিন্বো
আবো মশা হারিয়া জিআরো মশাহারিয়া।
তোমার লাগি আনবো পিয়া কানেয়াকা রিং
রাতিয়ামে খাটিয়াসে নাহি আবাই নিন্।।" (১০)

উদ্ধৃত গানটিতে চৈতা, বৈশাখা, গরামাকা, রাতিয়ামে, খাটিয়াসে, আবাই, নিন্, ছোড়, যানে দো, বাজারিয়া, ঝালামালাহা, মশাহারিয়া, কানেয়াকা, রাতিয়ামে, খাটিয়াসে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হয় খোট্টা বা হিন্দী ভাষায়।

মালদহের লোক-সাধারণের মধ্যে রাজবংশী জনসংখ্যা থাকায় কামরূপী উপভাষারও প্রভাব আলকাপ গানে লক্ষ্য করা যায়। যেমন -

" বাড়ির পাশে চম্পানদী
উলা কাহিশার বনরে।"(১১)

আলকাপের গানগুলোতে গীতিধার্মিতা সুচারুরূপে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ছন্দ ও অলংকার এই গানগুলোকে আরও বেশী সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

আলকাপের অনেক গীতি ও সংলাপে সাধুবাংলার প্রয়োগ দেখা যায়। ' জীবন-ব্রাহ্মণ পালা' য় একটি গানে দেখা যায় -

"ব্রাহ্মণীঃ সিপাহী দুঃখের কথা বলিব কি
আমার ঘরে নাইগো স্বামী।।
যত দুঃখের কথা আমার
বলিও রাজারে তোমার
সিপাহী, তিন চারিদিন হইতে আমি আছি অনাহারে।।" (১২)

মালদহের ডোমনী গানেও দেখা যায় মান্য চলিত ভাষা এবং সাধুভাষা ব্যবহৃত হতে। গানে সাধু ও চলিতের মিশ্রণ থাকে, কিন্তু গদ্যসংলাপে চলিত বাংলা ব্যবহৃত হয়। সামান্য কিছু আঞ্চলিক ও খোট্টাই হিন্দীও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

লোকনাটকে ভাব প্রতিবেশের সমুন্নতি শব্দনির্বাচনকে প্রভাবিত করে। প্রতিবেশের ভাবগত ওঠানামা ভৌগোলিক ভাবে ভিন্নভাষার দিকেও আঞ্চলিক ও উপভাষা ঠেলে দেয়। যার ফলে পার্শ্ববর্তী হিন্দীভাষা অথবা খোট্টাই ভাষার প্রভাব মালদহ জেলার প্রায় লোকনাটকেই দেখা যায়। বরেন্দ্রী উপভাষার সঙ্গে বিভিন্ন এলাকার আঞ্চলিক লোকভাষা এবং মান্যচলিতভাষার মিশ্রণও দেখা যায় নাটকের বিভিন্ন গীত-সংলাপে।

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার লোকনাটকের ভাষাঃ

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার লোকনাটকগুলো কামরূপীয় উপভাষায় রচিত হলেও এই জেলা দুটির আঞ্চলিক লোকভাষার উচ্চারণরীতি ও শব্দ ব্যবহারের আঞ্চলিকতা যেমন এখানকার লোক-ভাষাকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করেছে তেমনি এখানকার লোকনাটক গুলোকেও জনপ্রিয় করে তুলেছে। এই অঞ্চলের দেশী-পলি লোকসমাজে প্রচলিত লোকভাষা এখানকার লোকনাটকের প্রধান ভাষা। কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় লোকভাষার ভাষাভঙ্গীর শব্দগত উপাদান ও উচ্চারণগত পার্থক্য দেখা যায়। উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া, কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ থানা, দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমন্ডী থানা এবং এর সংলগ্ন মালদহের গাজোল থানার দেশী-পলি রাজবংশী সমাজে ব্যবহৃত লোকভাষা কামরূপী উপভাষা। কিন্তু উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর থানার লোকভাষা 'সূর্যাপুরী' অর্থাৎ বিহার সংলগ্ন হওয়ায় হিন্দী-ভোজপুরী-মৈথিল ভাষার প্রভাবে প্রভাবিত।

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার খন বা খিসার বন্দনা অংশটিতে সাধুবাংলা ও চলিত বাংলা ব্যবহার করার প্রতি ঝোঁক বেশী দেখা যায়। তবে সাধুবাংলার ব্যবহার সংলাপেও দেখা যায় - গাম্ভীর্য, প্রশান্তি, শ্রদ্ধা, বিনয় ইত্যাদি মহত্তর ভাব প্রকাশের জন্য। যেমন - 'মায়্যা বন্ধকী' পালায় দেখা যায় -

'' গুরুদেব - তুমি এখানে কেন আনন্দ?
আনন্দ - আমি আপনার কাছে আসিয়াছি আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য, গুরুদেব।.....''

গুরু উচ্চবর্গের লোক তাই তাঁর ভাষা চলিত ভাষা। আনন্দের ভাষা কামরূপী; কিন্তু গুরুর সঙ্গে কথা বলতে সে সাধুভাষা ব্যবহার করে, তাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য।

জীবন যাত্রার চলিষ্ণুতার সঙ্গে ভাষিক পরিবর্তন হয়। 'মায়্যা বন্ধকী' পালায় নুহাসাহার সংলাপ পরিবর্তিত হয়েছে। সে বাড়ির কামরূপী উপভাষা ব্যবহার করে, কিন্তু বাইরে নানা কাজে নানা লোকের সঙ্গে তাকে মিশতে হয় বলে সে বাইরে বাংলা চলিত ভাষা ব্যবহার করে। তবে বাইরে ব্যবহৃত ভাষায় শুদ্ধ চলিতের সঙ্গে বঙ্গালী ও কামরূপী উপভাষার মিশ্রণ হতে দেখা যায়। কারণ স্বাধীনোত্তর কালে উত্তরবঙ্গে বঙ্গালী ও কামরূপীর মিশ্রভাষারূপ প্রকটরূপে দেখা যায়। যেমন - 'মায়্যা বন্ধকীর একটি অংশে দেখা যায় -

'' নুহাসাহা - রায়গঞ্জতো আসলাম। কার কাপড়ের দোকানে যাব। তবে নামকরা দোকান মন্টুবাবুরই। তার কাছে যাই, তার একদর। ও মন্টুবাবু, কেমন আছেন?
মন্টু - ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন নুহা সাহা?
নুহা - ভাল আছি মন্টুবাবু।
মন্টু - আপনি কাপড় কিনবেন?
নুহা - তার জন্য তো আসছি আপনার কাছে।''

এই অংশটিতে দেখা যায় চলিত বাংলা ব্যবহৃত হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে কামরূপী ও বঙ্গালীর মিশ্রণ ঘটেছে। যেমন - চলিত বাংলার 'এলাম' হয়েছে 'আসলাম' এবং 'এসেছি' হয়েছে 'আসছি'। এধরণের ভাষা ব্যবহার করার উদ্দেশ্য নুহাসাহা শহরে এসে মধ্যবিত্তের সামাজিক মর্যাদার অংশীদার হতে চায়।

ভাবপ্রতিবেশের সমুন্নতির জন্য অনেক ক্ষেত্রে তৎসম শব্দ বা শব্দগুচ্ছ প্রয়োগের চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু উচ্চারণের বিচ্যুতিতে সেই সব তৎসম শব্দ অর্ধতৎসম শব্দে পরিণত হয়। যেমন, 'ঢাকোসরী' পালায় দেখা যায় —

"চিতাম-চিত্রিনি পদ্মিনী কইন্যা।

....

দ্রোপতি ছিল সতী কইন্যা।"

এই সংলাপে 'চিত্রিনি' (চিত্রানী), 'কইন্যা' (কন্যা), 'দ্রোপতি' (দ্রৌপদী) হয়েছে অর্ধতৎসম।

প্রতিবেশের ভাবগত ওঠানামা ভাষিক স্তরান্তরকে নিয়ন্ত্রণ করে। সংলাপে তাই দেখা যায় উপভাষা থেকে সাধুভাষার দিকে বা মান্যভাষার দিকে উন্নীত করার প্রবণতা।

ভৌগোলিক অবস্থান বা নাটকের ঘটনার উপস্থাপনার প্রয়োজনে ভৌগোলিক প্রতিবেশের ভিন্নতা সংলাপে মিশ্রভাষার রূপে দেখা যায়। যেমন —'সংসার গোপী' পালায় অবাঙালী জিলাদার ছপর সিংহকে হুকুম দিতে গিয়ে কামরূপী উপভাষাভাষী জমিদার সরূপনসিং গিরি হিন্দী ভাষার আশ্রয় নেয়।

ইসলামপুর থানার অধীনস্থ এলাকায় হিন্দী-ভোজপুরী-মৈথিলীর প্রভাব কামরূপী উপভাষায় পড়েছে। তাই সেখানকার লোকভাষাকে 'সূর্যাপুরী' বা 'কাইথী বাঙ্গলা'। সেখানকার খন পালাগুলোর সংলাপে সেখানকার ভাষা অর্থাৎ 'সূর্যাপুরী' বা 'কাইথী বাঙ্গলা' ব্যবহৃত হয়। 'অমাবস্যা-পুন্নিমা' খন পালার সামান্য অংশ তুলে দিলে সহজেই বোঝা যাবে সূর্যাপুরী ভাষার রূপ। যেমন—

" লেবর - হয়তো মালিকদা, তকৃদির যদি ঠিকছে, মেয়েত্র যদি চালাক বুদ্ধিমান আসে তাহলে কোনো চিন্তায় নাই।
সুন্দুর - তাহলে তুই মেয়ে দেখফা যা।
লেবর - অনং হলে তো মুই আজিয়ে চলে যাউ।
সুন্দুর - আজিয়ে কিরে,তুই এলায় চলে যা।
লেবর - এক পয়সা ডিমেন্টনাই, আর যদি মেয়ে ভালো হয়, তুই চারশ' টাকা যদি চালবা হয়, তাহলে চালায় দিম।"

খনগানে গীত ও সংলাপ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। তাই দেখা যায় গানগুলো হয় বিষয়বস্তু নির্ভর।

খনপালায় মেয়ে চরিত্রের সংলাপে কামরূপী উপভাষাই দেখা যায়। কারণ মেয়েদের জীবনযাত্রা রক্ষণশীল এবং চলিষ্ণুতা কম।

সাহিত্যিক বিচারে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের খনপালা গুলোর গান ও সংলাপের আলঙ্কারিক উৎকর্ষ তেমন নেই। অতি সাধারণ গীত ও সংলাপের মধ্য দিয়ে পালাগুলো পরিবেশিত হয় এবং জনমানসে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। গানগুলো হয় ছন্দোবদ্ধ এবং সুরের অবলম্বনে সুচারুরূপে প্রকাশিত হয় এবং হার্দ্য সোহাগ ঢালে।

জলপাইগুড়ি জেলার লোকনাটকের ভাষাঃ জলপাইগুড়ি জেলার যে লোকস্তরে লোকনাটকগুলো প্রচলিত তাদের লোকভাষা হল কামরূপী উপভাষা। এই উপভাষার জলপাইগুড়ি জেলার অঞ্চলভেদে ভাষিক রূপের পরিবর্তন হয়ে থাকে।

এই জেলার ধামগান বা পালাটিয়ার মান পাঁচালে কেন্দ্রীয়ভাষা বা মান্য চলিত ভাষা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ময়নাগুড়ির বার্নিশ অঞ্চলের পুটিমারী গ্রামের পূর্ণচন্দ্র রায়ের কাছ থেকে পাওয়া 'মীরাবাঈ' পালাটিতে চলিত বাংলা ব্যবহৃত হয়েছে দেখা যায়। (এই খাতাটি কমেও পঞ্চাশ বছর আগের, কারণ পূর্ণচন্দ্রবাবুর বয়েস এখন ১০৩ বছর)। 'মীরাবাঈ'

পালার একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল।

" কুম্ভ - ওরে বালক! আমিই তাকে স্বেচ্ছায় ভিখারিণী সাজিয়েছি। মীরা! প্রাণের মীরা! আমি না হয় নিষ্ঠুর রাক্ষস, তুমি দেবী করুণাময়ী দীনের বন্ধু জগবন্ধুর পরম ভক্ত! অভিমানীনী।"

(" মীরাবাঈ"।। মান পাঁচাল)

মান পাঁচালের ' ভেস্তেশ্বরী' পালাতেও একই ভাষারূপ দেখা যায়। যেমন -

" এই লড়াই চলবে,
লড়াই চলছে, আবার চলবে।
রে-ভাই, গরীব ধনীতে লড়াই চিরস্থায়ী।"

খাস পাঁচাল ও রঙ পাঁচালের আঞ্চলিক লোকভাষা ব্যবহৃত হয়। কামরূপী উপভাষা ব্যবহৃত হলেও কিছু কিছু প্রায়োগিক এবং উচ্চারণগত পার্থক্য অন্যান্য জেলাগুলোর সঙ্গে দেখা যায়।

জলপাইগুড়ি জেলার লোকভাষায় ব্যবহৃত কয়েকটি বিশেষ শব্দ এখানে উল্লেখ করা হল। যেমন, - সুনেক (শোন), হিমতন (এই রকম), তামান (সকল), আন্দিবো (রাঁধব), আন্দির নাহ (রাঁধতে পারি না), কাথা (কথা), নিকিলেক (বেড়িয়ে যা), হেটে (ওখানে), হিতি (এদিকে), হুটা (ঐটা), কায় (কে) , মুই (আমি) মানসি (মানুষ), গুয়া (সুপারি), নাম কিনা (নামটি), ছাওয়াক (ছেলেকে), নাগিবে (লাগিবে), সঙ্গরা (সঙ্গী, বন্ধু), উয়ার (ওর), জাওই (জামাই) ইত্যাদি।

গদ্য সংলাপে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কিন্তু গানে কখনও কখনও মান্য ভাষা ব্যবহারের ঝোঁক দেখা যায়। " পৈল সাঞ্জুর সংসার" পালার গানের ভাষায় এরূপ লক্ষ্য করা যায়। যেমন —

" (মেনকার গীত)
(পড়ান) স্বামীহে পতিরে ধন -
এমন করিয়া ছাড়িয়া নাযান দূর দেশে।
(চিতান) তুই স্বামী মোর নয়নের ওরে নয়ন
স্বামী ধরো তোরই চরণ।
স্বামী ছাড়া এই অভাগীর না বাঁচিবে জীবনরে
ওরে স্বামী ধন, না যান ছাড়ি দূর দেশে।।"

গানগুলোর গীতিধার্মিতা থাকলেও বিষয়বস্তু-প্রধান গদ্যসংলাপের পরিপূরক।

জলপাইগুড়ির লোকজীবনে কেন্দ্রীয় নাগরিকতার প্রভাব অনেক কম। ফলে এখানকার লোকভাষার ভাষাতাত্ত্বিক টানাপোড়েন এখনও অকৃত্রিমভাবে পাওয়া যায়।

কোচবিহার জেলার লোকনাটকের ভাষাঃ কোচবিহার জেলার আঞ্চলিক লোকভাষা কামরূপী উপভাষা হলেও তার উচ্চারণ রীতি ও প্রয়োগ অন্যান্য জেলার সঙ্গে যথেষ্ট পার্থক্য রচনা করে চলেছে। বহু বছর রাজন্য শাসিত অঞ্চল বলে এখানকার আঞ্চলিক ভাষায় অনেকখানি ঊর্ধমুখীনতা লক্ষ্য করা যায়। এই জেলায় প্রচলিত লোকনাটক 'কুশান' পালায় পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করা হয়। এতে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে মান্যভাষা ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। 'কুশান পালা'র অভিনয় কালে মূল পদগুলো মূলগ্রন্থ থেকে গৃহীত হয় এবং তার ভাষার কোন পরিবর্তন করা হয় না। অন্যান্য কুশীলবগণ আঞ্চলিক ভাষাই ব্যবহার করে থাকেন। "লক্ষ্মণের শক্তিশেল পালা" র দু-একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল —

" রামঃ ওরে বৎস হনুমান, উপারিয়া শেলপাট কর খানখান।
হনুমানঃ প্রভু, আপনার আদেশ শিরধার্য।

(হনুমান শেল টানাটানি করে ব্যর্থ হয়)
প্রভু, শক্তিতে নারিনু, সব ব্যর্থ হইল মোর।

মূলঃ (মূলপদ).....
দিলেন ধনুকবান সুগ্রীবের করে।
টানিলেন রঘুনাথ শেল পাট করে।।
বিশ্বম্ভর মূর্তি ধরি শেলে দিল টান।
উপারিয়া শেল পাট করে খান খান ।।"

অনেক সময় গীদাল বা মূলের শিক্ষা-সংস্কৃতির মানের উপরও ভাষা ব্যবহারের তারতম্য ঘটে।

লোকনাটকে ভাবপ্রতিবেশের উপর ভাষার ছাঁদ নির্ভর করে। কোচবিহারের দোত্‌রা গানের " বিশ্বকেতু-চন্দ্রাবলী পালায়' রাজপুত্র হয়েও বিশ্বকেতু আবেগময় পরিবেশে স্থানীয় উপভাষা ব্যবহার করেছে, কিন্তু রাজার সঙ্গে থোপকথনে ভাষার গতি ঊর্ধমুখী হয়েছে। যেমন -

" বিশ্বকেতু - বাবা, বহুদিন পর আমার শিকার করিবার মন হইল - আপনি আদেশ করেন।
উদয়কেতুঃ— বাছা, তুমি ছেলে মানুষ, তোমাকে কি করিয়া গভীর জঙ্গলে পাঠাব। সেখানে বাঘভালুক গন্ডার প্রভৃতি নানারকম জন্তু জানোয়ার থাকে, সেখানে কি করিয়া পাঠাব।
বিশ্বকেতু - আমি রাজার ছেলে, শিকার আমার কাজ।
আমাকে আদেশ দেন বাবা।"

কুশান ও দোত্‌রা পালায় কাহিনীর বিষয়বস্তু সাম্প্রতিকতার প্রভাবমুক্ত। ফলে যেমন নাটকীয় গুণ পালাগুলোতে রয়েছে, তেমনি রয়েছে সাহিত্যিক গুণ। এইসব নাটকে ব্যাপকভাবে প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন —

(ক) রাজার চাকরী বিষম দায়। (বিশ্বকেতু-চন্দ্রাবলী)
(খ) যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। (")
(গ) চেড়া খুঁড়িতে বোড়া বিরাইল। (")
(কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হল)
(ঘ) এক পুত্র মাটির ভান্ড। (")
(এক ছেলে মাটির পাত্রের মত ভঙ্গুর)
(ঙ) হৈল পুত না করি আনন্দ।
মৈল পুত না করি শোক। (")
(চ) আদা খায় যায়
ঝাল বুজবে তায়। (দুবুলাবালী)
(চ) ভাতার না গতে মোর নাম সোয়ামী। (")
(আদরহীনের গর্ব সব)
(জ) ব্যাং ম্যালে তদ্দুর,
গোয়া না হয় যদ্দুর। (")
(সাধ্যের অতিরিক্ত আস্ফালন করা)
(ঞ)নিলাজের নাককাটি ডেরাং দেয়,
নিলাজ কয় মোর বিয়াও হয়। (")
(বোকার আনন্দ নিজের ক্ষতিতে)

কোচবিহার জেলার বরেন্দ্রী প্রভাবে 'র' কে 'অ' উচ্চারণ করার রীতি প্রচলিত দেখা যায়। আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের জন্যই কুশান ও দোত্‌রা পালা লোক-সাধারণের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

দার্জিলিং জেলার লোকনাটকের ভাষাঃ দার্জিলিং জেলার সমভূমি অঞ্চলের পূর্বাংশে জলপাইগুড়ি জেলার এবং পশ্চিমাংশে উত্তর দিনাজপুর জেলার ভাষিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত। তাই এই অঞ্চলের রাজবংশী লোক-সমাজে যে নটুয়া পালা প্রচলিত রয়েছে তার ভাষাও একান্তই আঞ্চলিক। পশ্চিমাংশে বিহার সংলগ্ন হওয়ায় সূর্যাপুরী ভাষার প্রভাব এবং পূর্বাংশে জলপাইগুড়ি জেলার আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব নটুয়া পালাগুলোর ভাষায় দেখা যায়। পশ্চিমাংশে প্রচলিত 'কুঞ্জবন' পালার একটি পদের ভাষা লক্ষ্যণীয় —

" ঘুররে, ঘুররে কানু, পায়ে পড়ুরে তোর,
তুইরে কানু বিদেশ কালে, পরাণ কেসে বাঁচে মোর।"

'বিরক পালার' একটি পদে পুবাংশের ভাষার ছাঁদ লক্ষ করা যায় —

" যাইমু মরং দেশ, আনিমু পাখিড়ী পাতা,
লেখে পত্র পেঠামু স্বামীর সমান।"

তথ্যসূত্রঃ

(১) আশীষ কুমার দে ও সনৎ কুমার মিত্র সম্পাদিত — লোকভাষা। পৃঃ - ৩৩

(২) নির্মল দাস — জলপাইগুড়ি জেলায় বাংলাভাষা : অবস্থান, বিন্যাস ও সমস্যা। (মধুপর্ণী, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, ১৯৮৭)।

(৩) সনৎ চট্টোপাধ্যায় — সাদরী। (উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতি ওয়ার্কশপ ও উৎসব, জলপাইগুড়ি, ১৯৮০)।

(৪) সুনীল পাল — রাভাদের লোকবৃত্ত ঃ নৃত্যগীত ছড়া। (উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতি ওয়ার্কশপ ও উৎসব, জলপাইগুড়ি, ১৯৮০)।

(৫) বিমলেন্দু মজুমদার — টোটো উপজাতির লোকসাহিত্য। (উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতি ওয়ার্কশপ ও উৎসব, জলপাইগুড়ি, ১৯৮০)

(৬) নির্মল দাস — লোকনাট্যের সংলাপঃ ভাষাতাত্ত্বিক বিচার। (লোকশ্রুতি, ডিসেম্বর, ১৯৮৬) পৃঃ - ৫৬।

(৭) ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানা গেছে।

(৮) পুষ্পজিৎ রায় — গম্ভীরার কথা। পৃঃ ৭৮।

(৯) প্রাগুক্ত। পৃঃ ৯৯

(১০) ডঃ ফনীপাল —আলকাপ। পৃঃ ৮৫

(১১) প্রাগুক্ত।

(১২) সুবল দেশী, ধ্যামধ্যামা, মালদহ। (ক্ষেত্রসমীক্ষা)